যায়যায়দিন
2 8 JAN 2007

ড. মোহাম্মদ আবদুল হাই তালুকদার

রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অনিয়ম প্রসঙ্গে

জাতীয় ও স্থানীয় কয়েকটি পত্রিকায় 'শিক্ষা উপদেষ্টাকে রাবির সচেতন শিক্ষক সমাজের স্মারক' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ইউনিভার্সিটির একজন সচেতন শিক্ষক হিসেবে এ বিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানানো নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করছি।

বিগত সরকারের আমলে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা বলে এসব নিয়োগ বাতিল ও রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম আলতাফ হোসেনের অপসারণ দাবি করা হয়েছে। সচেতন শিক্ষক সমাজের দাবি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টার স্মারকলিপিটি পাঠানো হয়েছে।

বিগত সরকারের আমলে ইউনিভার্সিটিতে নানা কারণে তিন বছর পর নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা, সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন ইত্যাদি কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় ছয় বছর বন্ধ থাকার পর চালু হয়েছে। এজন্য শূণ্য পদের সংখ্যা বেড়েছে তবে নতুন কোনো সহায়ক বা সাধারণ কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়নি।

১৯৯৮ সালে কেবল একটি সেমিনারে বেয়ারার পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। উপরোক্ত অনুষদের প্রতিটি বিভাগে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত (১৯৫৩) হওয়ার পর থেকে তিনটি সহায়ক কর্মচারী ও দুটি পিয়ন/বেয়ারারের পদ ছিল। নতুন করে কোনো সহায়ক বা সাধারণ কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা যায়নি।

প্লানিং কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও দর্শন বিভাগে ইউনিভার্সিটির অর্গানোগ্রামের মধ্যে না পড়ায় কোনো সহায়ক/সাধারণ কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়নি। ২০০৬ সালের ১২ মার্চ দর্শন বিভাগের প্লানিং কমিটি থেকে তিনজন সহায়ক ও চারজন সাধারণ কর্মচারীর পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সব সরকারের আমলেই চাহিদা অনুসারে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়। এটি খুবই স্বাভাবিক।

প্রথমদিকে বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র সংখ্যা ছিল অনেক কম। কোর্সের সংখ্যাও কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে কোর্সের সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি ও তিন বছর থেকে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু হওয়ায় শিক্ষক সংখ্যা ৩/৪ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শিক্ষক সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ইউনিভার্সিটি অর্গানোগ্রাম ভঙ্গ করে কোনো পদ সৃষ্টি বা অনিয়ম করে কর্মচারী, কর্মকর্তা বা শিক্ষকের নিয়োগ দেয়া হয়নি।

১৯৫৩ সালে ইউনিভার্সিটিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইউনিভার্সিটি। সূচনালগ্ন থেকে উত্তরবঙ্গের উচ্চ শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ হিসেবে একাডেমিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ১৮৯৭ সালের একটি অ্যাক্টের ক্ষমতাবলে প্রফেসর সাইদুর রহমানকে ভাইস চ্যান্সেলরের পদ থেকে সরিয়ে প্রফেসর ফারুকীকে ওই পদে নিয়োগ দেয়া হয় এ কথা সত্য। তবে এভাবে সিনেটের নির্বাচিত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইউসুফ আলীকে সরিয়ে ১৯৯৬ সালে প্রফেসর আবদুল খালেককে ভাইস চ্যান্সেলরের পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এ উদাহরণটি আগে সংঘটিত কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা মাত্র।

নানারকম অভিযোগের জবাবে এটুকু বলা যায়, ইউনিভার্সিটির নিয়মনীতি মেনে বিভিন্ন বডি বা কমিটির অনুমোদিত সব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

কোনো ভাইস চ্যান্সেলর চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন না। যেমন অর্ডিন্যান্স সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজনের ক্ষেত্রে অনুষদের সুপারিশকৃত বিষয় একাডেমিক কাউন্সিলে এজেন্ডা করে এখান থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাউকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিতে হয়।

দেশে আইন-আদালত আছে। কিছুদিন আগে নৈতিক স্খলনের অভিযোগে একজন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। ওই শিক্ষক হাই কোর্ট থেকে তার চাকরি বহাল থাকার আদেশ পেয়েছেন। এভাবে ইউনিভার্সিটির সব কাজকর্ম নিয়মনীতি ছকে বাধা। ইচ্ছা করলে কাউকে নিয়োগ, কাউকে বরখাস্ত বা সাময়িক বরখাস্ত করার ক্ষমতা ইউনিভার্সিটির প্রশাসনের নেই।

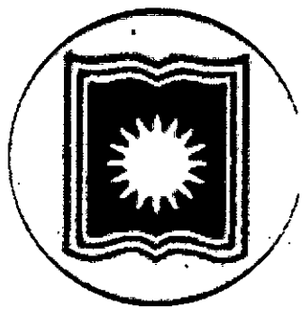

ইউনিভার্সিটির সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে নিয়োগ, বদলি, প্রমোশন দেয়া হয়। কোনো শর্ত পূরণ না করলে কোনো প্রার্থী নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে দরখাস্তও করতে পারবে না।

তবে এ কথা সত্য, বিগত প্রশাসন ২০০০ সাল থেকে প্রায় তিন বছর নিয়োগ বন্ধ থাকায় বহু পদ ফাকা হওয়ায় বিভিন্ন বিভাগ, হল, অনুষদ ও দফতরের চাহিদার ভিত্তিতে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে বেশ কিছু কর্মচারী নিয়োগ দেয়। উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রতি বছর প্রায় ১০০ জন করে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অবসরে যান। সুতরাং তিন বছর বন্ধ থাকার পর বেশ কিছু সহায়ক ও সাধারণ কর্মচারী দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ পান। কোনোরকম অনিয়ম বা দলীয় বিবেচনায় নয়।

গণহারে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে যে দাবি করা হচ্ছে তা বস্তুনিষ্ঠ নয়। এসব সহায়ক ও সাধারণ কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। ১২০০ কর্মচারী নয় বরং দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের সঙ্গে ১৯৯৬ সালে মাস্টাররোলে নিয়োগপ্রাপ্ত ও নতুন করে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় সহায়ক ও সাধারণ কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। কোনোরকম স্বজনপ্রীতি বা দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ার সুযোগ বা সুবিধা কোনোটিই নেই।

বিগত প্রশাসনে বিভাগের প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কিছু শিক্ষককে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমান প্রশাসন এসে ওইসব অ্যাডহক নিয়োগকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্থায়ী করেছে মাত্র। তাছাড়া বিভাগের প্লানিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কিছু বিভাগে শিক্ষকের পদ বিজ্ঞপ্তি করা হয়েছিল। পরে নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশের (সর্বসম্মত) ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো বিভাগে বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত বিভাগের চাহিদার প্রয়োজনে শিক্ষক নেয়া হয়েছে যার নজির আগেও রয়েছে। যেসব শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার সবগুলোতেই বিভাগের সভাপতির সম্মতি রয়েছে।

এখনো বহু বিভাগের বহু শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। যেমন ইংরেজি ভিাগে ২৪টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে ১৫ জন, অর্থনীতি বিভাগে ৩৭টি পদের বিপরীতে ১৯ জন, ইতিহাস বিভাগে ২৫টি পদের বিপরীতে ১৮ জন, বাংলা বিভাগে ২৫টি পদের বিপরীতে ১৪ জন কর্মরত আছেন। বিভাগের চাহিদা ছাড়া কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি বলে অনেক বিভাগে শিক্ষকের বহু পদ শূন্য রয়েছে।

বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর দায়িত্ব গ্রহণের পর কোনোরকম অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির আশ্রয় না নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশাসন পরিচালনা করছেন। বর্তমান প্রশাসনে এতো নিরপেক্ষভাবে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে যার উজ্জ্বল প্রমাণ হলো এ সময়ে একজনও শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারী অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ পায়নি। পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষককে বঞ্চিত করা হয়নি। পক্ষপাতিত্ব বা অনিয়মের অভিযোগ সাধারণত শিক্ষক সমিতির কাছে করা হয়। রাজশাহী ইউনিভার্সিটি শিক্ষক সমিতির কাছে কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব বা অনিয়মের অভিযোগ করে একটি আবেদনও করা হয়নি।

বর্তমানে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি খুবই ভালো ভাবে চলছে। ইতিমধ্যে ২০০৭ সালের প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পথে। ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ থেকে প্রথম বর্ষ ক্লাস শুরু হবে। বর্তমান প্রশাসনের গতিশীল ও দূরদর্শী কার্যক্রমে ইউনিভার্সিটির সেশনজট দূর হয়েছে।

প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস ও প্রফেসর এস তাহের আহমদের হত্যার বিচার শেষ না হওয়ায় ভাইস চ্যান্সেলরের করণীয় যা কিছু করার আছে তা নিয়ম মেনেই করেছেন ও করছেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছেন বলে আমাদের জানা আছে। আমি ২০০৫ সেশনে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। তখন দেখেছি তিনি এ বিষয়ে কতোটা আন্তরিক। তিনি হত্যার যথাযথ বিচারের বিষয়ে সঠিক ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন।

হত্যার বিষয়ে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির গোটা শিক্ষক সমাজ সোচ্চার। সবাই এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু আইন-আদালতের বিষয়ে আমাদের করণীয় কিছুই নেই। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলছে। আমরা সবাই আশা করছি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় হত্যাকাণ্ডের সঠিক বিচার হবে।

প্রফেসর ও সভাপতি দর্শন বিভাগ,
রাজশাহী ইউনিভার্সিটি